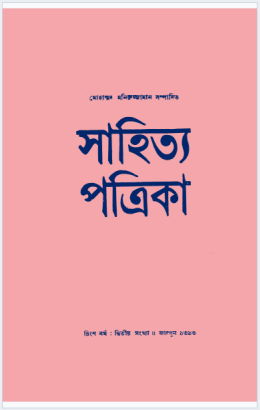

Vol. 30 | No. 2 | 1987

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চা।

Volume	30
Issue	2
Year	1987
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	রফিকুল ইসলাম
Published online	February 1, 1987
DOI	10.62328/sp.v30i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v30i2.2
Pages	7-19
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চা

রফিকুল ইসলাম

বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব-চর্চার শুরু ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এবং তা বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগকে কেন্দ্র করে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান এবং সম্ভবত তাঁরই অনুপ্রেরণায় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' বা 'চর্যাপদ' নিয়ে গবেষণায় অগ্রণী হয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম ছাত্র ছিলেন সেহেতু তাঁর ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রে অভিষেক পূর্বাহ্নেই সম্পন্ন হয়েছিল। ফ্রান্সে উচ্চ-শিক্ষার সময় তিনি বিশিষ্ট প্রাচ্য ভাষাবিদ মঁুল ব্লকের সংস্পর্শে আসেন এবং তা তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক দক্ষতাকে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব চর্চার অগ্রণী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং তা শুধু ফরাসী বা ইংরেজী ভাষায় নয় বাংলা ভাষাতেও বটে। ভাষাতত্ত্বের কালানুক্রমিক, তুলনা-মূলক ও বর্ণানুক্রমিক তিনটি পদ্ধতিতেই শহীদুল্লাহ্ এবং তাঁর শিষ্য বা প্রশিষ্যগণ বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এবং কিছু অবদান রেখেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষায় ভাষা-তত্ত্ব চর্চা করে আসছেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রে উৎসাহী হবার পূর্ব থেকে। সুনীতি বাবুর ভাষাতত্ত্বে প্রধান কাজগুলি ইংরেজী ভাষাতে সম্পন্ন। তাঁর 'The Origin and Development of the Bengali Language' (1926) এবং 'A Bengali Phonetic Reader' (1928) বাংলা ভাষা বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী কর্ম এবং বাংলাভাষায় কালানুক্রমিক ও বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের মূল ভিত্তি। "বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা" (১৯২৯) বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ইতিহাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র কালানুক্রমিক-তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত" (১৯৬৫) বস্তুতপক্ষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের O. D. B. L.-এর একটি পরিপূরক গ্রন্থ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায় প্রতিটি প্রাসঙ্গিক বিষয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতামত পরীক্ষা এবং যেসব ক্ষেত্রে একমত হতে পারেননি তা যুক্তিসহকারে উপস্থাপিত করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বাংলা ভাষার উদ্ভব কাল ও উদ্ভব প্রক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতের কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি গ্রীয়ারসন-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মাগধী প্রাকৃত এবং মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভবের তত্ত্ব সমর্থন করেননি, তাঁর মতে বাংলা ভাষা গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে উদ্ভূত এবং বাংলা ভাষার জন্ম কালকে তিনি আরো চারশত বৎসর পূর্বাহ্নে নির্দেশ করেছেন। তবে গৌড়ীয় প্রাকৃত বা গৌড়ীয় অপভ্রংশের অস্তিত্বের পক্ষে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেও প্রাকৃত বা অপভ্রংশের গৌড়ীয় রূপের বিস্তৃত পুনর্গঠন তিনি করেননি। তিনিও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতো নব্য ভারতীয় আর্য-ভাষার প্রাচ্য শাখার গ্রীয়ারসনকৃত শ্রেণীবিন্যাসকে নতুন ভাবে বিন্যস্ত করেছেন, গ্রীয়ারসনের বাংলা উপভাষার শ্রেণী বিন্যাসকেও তিনি সুনীতিবাবুর মতো নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী সাজিয়েছেন। বাংলা ভাষায় অনার্য প্রভাব সম্পর্কে তিনি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের দ্রাবিড় প্রভাব-তত্ত্বকে নাকচ করে দিয়ে মুণ্ডা প্রভাবের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং মুণ্ডার সঙ্গে বাংলার ধ্বনি ও রূপগত সাদৃশ্য প্রদর্শন করেছেন। মোটকথা শহীদুল্লাহ্ তাঁর "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিবর্তন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাসমূহকে জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিষয়-গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়;

বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস/হিন্দ-য়ুরোপায়ন হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত ক্রমিক ধারা/বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবিধ মত-মাগধী বনাম গৌড়ীয়/নব্য ভারতীয় আর্যভাষাসমূহের প্রাচ্য শাখা/প্রাচীন বাঙ্গালা হইতে আধুনিক বাঙ্গালা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তর/বাঙ্গালা ভাষায় অনার্য প্রভাব, মুণ্ডা প্রভাব, বৈদেশিক প্রভাব/বাঙ্গালা উপভাষাসমূহ/বাঙ্গালা ধ্বনিতত্ত্ব/আধুনিক বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি/স্বরাঘাত/প্রাচীন

ভারতীয় আর্যভাষার স্বরধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন/ব্যঞ্জনধ্বনির বাঙ্গালায় বিবর্তন/কারক বিভক্তির ইতিহাস/ক্রিয়াপদ-বর্তমান কাল নির্দেশ ও আদেশ ভাব/কর্মবাচ্য/প্রযোজক ক্রিয়া/অসমাপিকা ক্রিয়া/যুগ্মক্রিয়া/বাঙ্গালা কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয়/স্ত্রী প্রত্যয়/লিঙ্গ প্রকরণ/শব্দাবলী/বাক্যরীতি/হিন্দ-য়ুরোপায়ন ভাষা স্তরের কালক্রম/বাংলা ভাষার কুলজী।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঐ গ্রন্থে বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত পরীক্ষা করে "সংস্কৃত ভাষা বাংলা ভাষার জননী" সংস্কৃত পণ্ডিতদের এই মত খণ্ডন এবং সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার সাক্ষাৎ জননী নয় দূরসম্পর্কের আত্মীয়রূপে বর্ণনা করেছেন। বাংলা ভাষার অব্যবহিত পূর্বরূপ হিসেবে তিনি যথাক্রমে অপভ্রংশ, প্রাকৃত, অশোক অনুশাসন বা পালি এবং আদিম প্রাকৃতকে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু তাঁর গ্রন্থে উপেক্ষিত হয়েছে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার পালি--প্রাকৃত--অপভ্রংশ এই তিনটি স্তরের ধ্বনি, রূপ ও বাক্যতত্ত্ব বর্ণনা। এই গ্রন্থে তিনি ইন্দো-ইউরোপীয়, প্রাচীন ভারতীয় আর্য, নব্য ভারতীয় আর্য, প্রাচীন বাংলা, আদি-মধ্য, অন্ত--মধ্য ও নব্য-বাংলার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বিবর্তন বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করেছেন অথচ ইন্দো-ইরানীয় এবং মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তরই তাঁর আলোচনা থেকে বাদ পড়ে গেছে।

শব্দের বা বিভক্তির ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অপরিসীম দক্ষতা ছিল, বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় উর্দু উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত উর্দু অভিধানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উর্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে তিনি মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে বিভিন্ন বাংলা শব্দ বা পদ বা বিভক্তির সুনীতিকুমার প্রদত্ত ব্যুৎপত্তি বহু ক্ষেত্রে তিনি গ্রহণ করেননি এবং যুক্তি সহকারে নিজস্ব ব্যুৎপত্তি প্রদান করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে গ্রীয়ারসন বা সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস প্রকাশের পরে কেন তিনি নতুন করে বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে নিজস্ব গবেষণালব্ধ ধারণা থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন নিজস্ব মতামত তুলে ধরার জন্যে ফলে বাংলা ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনের কর্মে যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিংশ শতাব্দীতে ভাষাতত্ত্ব চর্চা

করলেও বাংলা ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠনে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রচলিত কালানুক্রমিক-তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে তাদের পূর্বে বাংলা ভাষার ইতিহাস রচিত হয়নি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ফ্রান্স এবং জার্মানীতে ধ্বনিতত্ত্বেও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন কিন্তু তাঁর ঐ জ্ঞান কালানুক্রমিক--তুলনামূলক পদ্ধতিতে ভাষার ইতিহাস পুনর্গঠন প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। অথচ আধুনিক ধ্বনিতত্ত্বে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রথম বাঙালীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বাংলাদেশের 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' সম্পাদনা এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মও ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বাংলা ভাষাতত্ত্বে বিশেষ অবদান।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রখ্যাত ইংরেজ ধ্বনিবিদ ডেনিয়েল জোনস্-এর ইংরেজী ভাষার ফোনিম নির্ণয়ের পদ্ধতির অনুসরণে শিষ্টকথ্য বাংলার ফোনিমসমূহ নির্দেশ করেছিলেন, তিনি বিচ্ছিন্নভাবে বাংলা ধ্বনিমূলগুলো সনাক্ত করলেও ভাষায় ব্যবহারে ঐ ধ্বনিমূলগুলোর মধ্যে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয় তার আলোচনাকে সে বিশ্লেষণে সম্প্রসারিত করেননি। সে কাজটি সম্পন্ন করেন বাংলা-দেশে বাংলা ভাষায় বর্ণনামূলক ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনার পথিকৃত মুহম্মদ আবদুল হাই। তিনি বিলেতে অধ্যাপক জে. আর. ফার্থের তত্ত্বাবধানে বাংলার নাসিক্যধ্বনি এবং নাসিক্যীভবন সম্পর্কে যে ধ্বনিতাত্ত্বিক গবেষণা করেন তার ফল ইংরেজী ভাষায় A phonetic and phonological study of Nasals and Nasalization in Bengali. (১৯৬০) গ্রন্থে প্রকাশিত। দেশে প্রত্যাবর্তন করে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই standard বা শিষ্ট কথ্যবাংলা ভাষার ধ্বনি এবং ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণে ব্রতী হন এবং তাঁর গবেষণালব্ধ ফল "ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" (১৯৬৫) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। মুহম্মদ আবদুল হাই-এর এই গ্রন্থটি অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় রচিত বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব পর্যালোচনার সর্বাধিক গভীর বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ। আবদুল হাই এ গ্রন্থে বাংলা স্বরধ্বনির সংখ্যা, দ্বিস্বর এবং অর্ধস্বরের গঠন, ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিচয়, বাক্‌প্রবাহে ধ্বনির রূপ, সন্ধি ও সামগ্রিকীভবন, ধ্বনিগুণ এবং স্বরতরঙ্গ বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন। এই বিশ্লেষণে বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে

বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পূর্বে তিনি যে দৃষ্টান্তের পর্যালোচনা করেন তার অজস্রতা ও ব্যাপকতা সত্যই বিস্ময়কর। এতে বোঝা যায় যে অলোচ্য গবেষণাটি যথার্থ ফিল্ডওয়ার্ক বা ক্ষেত্রীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে সম্পন্ন।

মুহম্মদ আবদুল হাই-এর "ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব" বাংলা ভাষায় বাঙালীর মুখের ভাষার standard বা শিষ্ট রূপের প্রথম বিস্তৃত ফোনেটিক বিশ্লেষণ। এ গ্রন্থে যদিও তিনি মূলতঃ উচ্চারণ স্থান ও উচ্চারণরীতির মাপকাঠিতে কথ্য বাংলার ধ্বনিগুলিকে বিশ্লেষণ করেছেন কিন্তু সে কাজে তিনি নকল তালু ও কাইমোগ্রাফ যন্ত্রের সহায়তা গ্রহণ করেন। শুধু বিচ্ছিন্ন ধ্বনি সনাক্তকরণ নয় বাক্-প্রবাহে বিভিন্ন অবস্থানে অন্যান্য ধ্বনির সংস্পর্শে তাদের যে রূপান্তর তাও তিনি বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ এবং ধ্বনিগুলির সে বৈশিষ্ট্যকে "ধ্বনিগুণ" শীর্ষক অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করেছেন। মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষায় প্রথম বাংলা ধ্বনিগুলির ধ্বনিগুণের পরিমাপক, অধ্যাপক জে. আর. ফার্থের 'প্রসডিক' পদ্ধতিতে তিনিই প্রথম বাংলা ধ্বনিগুলির বিস্তৃত ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকারী।

অধ্যাপক আবদুল হাই-এর পর অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের হার্বার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের প্রবর্তক লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের পদ্ধতির অনুসরণে অধ্যাপক চার্লস ফার্গুসনের সঙ্গে মিলিত-ভাবে বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করেন। ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরীর বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব বিশ্লেষণ ফোনেমক পদ্ধতিতে সম্পন্ন, এই বিশ্লেষণে তাঁরা নতুনভাবে বাংলা অর্ধস্বরধ্বনি নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ এবং প্রাগ স্কুলের স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য পদ্ধতি অবলম্বনে সর্বপ্রথম বাংলা ধ্বনিগুলির বৈপরীত্যসূচক বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা ছিল ইংরেজী ভাষায় এবং "Language" পত্রিকায় প্রকাশিত সুতরাং বাংলা ধ্বনিতত্ত্বের এই অভিনব বিশ্লেষণটি বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানের বাইরে থেকে যায়। মুনীর চৌধুরী পরবর্তিতে "বাংলা একাডেমী" পত্রিকায় "সাহিত্য, সংখ্যাতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব" বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখলেও পূর্বোল্লেখিত প্রবন্ধের অনুবাদ বা ঐ বিষয়ে বাংলায় কিছু লেখেননি। অথচ তিনিই ছিলেন সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার সংগঠন বিশ্লেষণে সবচেয়ে

উপযুক্ত ব্যক্তি। সাংগঠনিক ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কথ্য বাংলার ধ্বনি ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়াস রয়েছে আমার "ভাষাতত্ত্ব" (১৯৭০) গ্রন্থে। আমার ভাষাতত্ত্ব শিক্ষা লিওনার্ড ব্লুমফিল্ডের ছাত্র চার্লস এফ. হকেটের কাছে। সুতরাং আমার ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা বর্ণনামূলক পদ্ধতির সাংগঠনিক বিশ্লেষণরীতি দ্বারাই গঠিত। আর সে কারণে আমি "ভাষাতত্ত্ব" গ্রন্থে সাংগঠনিক রীতিতে একটি ভাষার ধ্বনি ও রূপ সংগঠন বিশ্লেষণের পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগে বাংলা ধ্বনি ও রূপ সংগঠন বিশ্লেষণ করার প্রয়াস পেয়েছি। তবে আমার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. থিসিস "Bengali Graphemies" (1960) এবং মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মনোগ্রাফ Introduction to Eastern Bengali Dialed (1963) বাংলায় অনূদিত বা প্রকাশিত হয়নি।

প্রসঙ্গক্রমে স্বীকার্য যে আমি কথ্য বাংলার ধ্বনিসংগঠন বিশ্লেষণে চার্লস ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরীকে এবং রূপ সংগঠন বিশ্লেষণে চার্লস ফার্গুসনকে অনুসরণ করেছি। ধ্বনিমূল, সহধ্বনিমূল, রূপমূল, সহরূপমূল ধারণা প্রয়োগ করে চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাংগঠনিক ভাষাতত্ত্বের যে বিকাশ হয় বাংলা ভাষায় বাংলা ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় আমি তা সংযোজন করার প্রয়াস পেয়েছি। আমার গ্রন্থে কালানুক্রমিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে যে অধ্যায় রয়েছে সেখানে আমি "language" গ্রন্থে ব্লুমফিল্ড-এর আলোচনার অনুসরণ করেছি।

বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চা রূপান্তরমূলক যুগে প্রবেশ করে সত্তর দশকে যখন আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে ভাষাতত্ত্বে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরে "বাংলাভাষাতত্ত্ব" (১৯৭৫) নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সাধারণ পাঠককে পরিচিত করানোর প্রয়াস পান। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনায় সাংগঠনিক পদ্ধতি এবং শব্দতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ চমস্‌কি প্রবর্তিত পদ্ধতির প্রয়োগ কারন। বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় চমস্‌কির পদ্ধতি তিনিই প্রথম প্রয়োগ করার দাবীদার। ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি কেনেথ এল পাইক এবং চার্লস হকেট আর শব্দতত্ত্ব বিষয়ে

চমস্‌কির পদ্ধতি মূলতঃ অনুসরণ করলেও হ্যারিস এবং বোলিনজার আদর্শের সহায়তাও গ্রহণ করেন। বাক্যতত্ত্ব আলোচনায় এ গ্রন্থে ফ্রিজের কথা স্মরণ রেখে চমস্‌কি পদ্ধতি গৃহীত হয়। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান বৃদ্ধির জন্যে পুনরায় বিদেশে পাড়ি জমান, এবারে তিনি স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং "বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম" সম্পর্কে গবেষণা করেন যা "Relativization in Bengali" (১৯৮৬) নামে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ দ্বিতীয় বার দেশে প্রত্যাবর্তনের পর "আধুনিক ভাষাতত্ত্ব" (১৯৮৫) নামে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন শাখা ও পদ্ধতি, ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব, ভাষার শ্রেণীবিন্যাস, উপভাষাতত্ত্ব, লিখনরীতি, ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ইতিহাস, ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব এবং বাগর্থতত্ত্ব, সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে। বাক্যতত্ত্ব অধ্যায়ে তাঁর আলোচ্য বিষয়, প্রথাগত বাকরণে বাক্যতত্ত্ব, সাংগঠনিক বা গঠনমূলক ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব এবং রূপান্তরমূলক ব্যাকরণে বাক্যতত্ত্ব। এ গ্রন্থে বাংলা বাক্যতত্ত্ব ও রূপান্তরমূলক সূত্র সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> চলতি বাংলার বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে চমস্কি প্রবর্তিত রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের সূত্র সম্পূর্ণ প্রয়োগযোগ্য নয়। চমস্কি কারক সম্পর্কে কোন সূত্রের উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে ফিলমোর (১৯৬০) যে-সব ভাষায় বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কারকের গুরুত্ব বিদ্যমান, কারক বিষয়ক নতুন সূত্রের ব্যবহার করে বাক্যতত্ত্ব বিশ্লেষণের নতুন সূত্র সংযোজন করেন। বাংলা বাক্যতত্ত্বে ব্যাকরণগত উপাদানের জটিলতার জন্যে রূপান্তর-মূলক ব্যাকরণের কয়েকটি সূত্রের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এর এডিনবরাস্থ গবেষণাকর্মটির বাংলা রূপান্তর "বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ঃ গঠন ও প্রকৃতি" (১৯৮৫) গ্রন্থে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, সর্বনামীয় বাক্যাংশ এবং সম্বন্ধ-বাচকতা গঠনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। বিষয়বস্তু

অনুসারে গ্রন্থটি দুটি পর্যায়ে বিভক্ত, প্রথম পর্যায়ে বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনামীয় বাক্যাংশ গঠনের বিভিন্ন দিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি রূপান্তরমূলক সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক গঠনের মধ্যে সম্বন্ধ-বাচক সর্বনাম যে ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব—সে সম্পর্কে তত্ত্বীয় দিক নির্দেশ। অর্থাৎ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের আলোচ্য বিষয়, বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম, এই শ্রেণীর সর্বনাম দ্বারা গঠিত বাক্যাংশ, সম্বন্ধবাচক সর্বনাম ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বা আপেক্ষিক সর্বনাম জটিল বাক্যে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে যে-ভাবে সর্বনামীয়করণ প্রক্রিয়া সাধিত হয় তার বর্ণনা এবং রূপান্তরমূলক সূত্রের প্রয়োগে বাংলায় সর্বনামীয়করণের বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ। বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম বা সর্বনামীয় বাক্যাংশের ওপর তেমন বিস্তৃত আলোচনা ও তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা না থাকায়, আবুল কালাম মনজুর মোরশেদকে বিভিন্ন শ্রেণীর সর্বনামীয় বাক্যাংশ ও সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা উদ্ভাবন করতে হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ standard বা শিষ্ট চলতি বাংলা ভাষার সঙ্গে নোয়াখালীর উপভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক ও বাক্যগঠনগত পার্থক্য নিরূপণে সাংগঠনিক পদ্ধতি অনুসরণ করলেও বাক্যতত্ত্বে চমস্কি পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব কি না তা পরীক্ষা করেন এবং বাংলাভাষার বাক্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ঐ পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর এ গ্রন্থটির নাম A study of standard Bengali and the Noakhali Dialect (1985)

বাংলাদেশে চমস্কিপ্রবর্তিত "রূপান্তমূলক সৃষ্টিশীল" ভাষাতত্ত্বের সবচেয়ে উৎসাহী প্রবক্তা ও অন্যতম পথিকৃৎ হুমায়ূন আজাদ, তিনিও ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিদেশে হুমায়ুন আজাদের গবেষণার বিষয় ছিল "Pronominalisation in Bengali" (১৯৮৩) ইংরেজী ভাষাতেই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে হুমায়ুন আজাদ ফিলমোর এর Case gramme এবং চমস্কীর Aspect এর পরবর্তী মডেলের মিশ্র ভিত্তিতে গঠিত একটি কাঠামোতে বাংলা সর্বনাম প্রধান বাক্য গঠনের প্রাক্রিয়া বিশ্লেষণ করেন।

হুমায়ূন আজাদ অবশ্য তাঁর বিদেশে গবেষণার ফল দেশে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি তিনি বাংলা ভাষায় "বাক্যতত্ত্ব"

(১৯৮৫) নামে একখানি বড় গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে তিনি বাক্য, প্রথাগত বাক্যতত্ত্ব, সাংগঠনিক বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনার পর রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা এবং সেই তত্ত্ব বাংলা বিশেষ্য পদ এবং বাংলা সর্বনামীয়করণের ওপর প্রয়োগ করেছেন। পাঠকদের সুবিধার জন্যে পরিশিষ্টে তিনি প্রথাগত ব্যাকরণ এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে দুইটি পরিচ্ছেদে আলোচনা রেখেছেন। গ্রন্থটি শেষ হয়েছে প্রথাগত, সাংগঠনিক ও রূপান্তরমূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের তুলনার মধ্য দিয়ে। 'বাক্যতত্ত্ব" গ্রন্থে হুমায়ুন আজাদ মূলতঃ বাংলা বিশেষ্যপদ এবং সর্বনাম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, বাংলা ক্রিয়াপদ সম্পর্কে নয়।

এ গ্রন্থে হুমায়ূন আজাদ "প্রথাগত", "সাংগঠনিক" ও "রূপান্তর-মূলক সৃষ্টিশীল ব্যাকরণ" এর তুলনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন,

> সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান জন্মেছে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রতিক্রিয়ায় এবং রূপান্তর ব্যাকরণ উদ্ভূত হয়েছে প্রথাগত ব্যাকরণের প্রেরণায় ও সাংগঠনিক প্রণালির প্রতিক্রিয়ায়। সাংগঠনিকেরা প্রথাগত ব্যাকরণকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন: তাঁদের দৃষ্টিতে প্রথাগত ব্যাকরণ বিশৃঙ্খল ও অবৈজ্ঞানিক। রূপান্তরমূলক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে প্রথাগত ব্যাকরণের চেয়েও দুর্বল সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান, কেননা তা ভাষার সৃষ্টিশীলতায় বিশ্বাস না করে ভাষার খণ্ডাংশের বহিরঙ্গের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। রূপান্তরবাদীরা সাংগঠনিক প্রণালি পরিত্যাগ করেছেন: তাঁদের বোধে সাংগঠনিক ব্যাকরণ ছদ্ম বৈজ্ঞানিক তা বিজ্ঞানের বহিরঙ্গের অনুকরণ করেছে মাত্র। রূপান্তর ব্যাকরণ পুনরায় যোগসূত্র রচনা করেছে প্রথাগত ব্যাকরণের সাথে।

বাংলাদেশে আরো যারা ভাষাতত্ত্ব চর্চায় রত তাদের মধ্যে রয়েছেন কাজী দীন মুহম্মদ, মনিরুজ্জামান, মনসুর মুসা, রাজীব হুমায়ূন, দানিউল হক, আজিজুল হক প্রমুখ। কাজী দীন মুহম্মদ লন্ডনের

SOAS-এ ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং বাংলা ব্যাকরণের ক্রিয়াবাচকপদের সংগঠনে ধ্বনিতাত্ত্বিক সূত্রসমূহ পরীক্ষা করেন। তাঁর অভিসন্দর্ভটি ইংরেজী ভাষায় রচিত এবং তা কিছুদিন আগে "The Verbal Structure in Colloquial Bengali" নামে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা ক্রিয়াপদ ও তার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক এই গবেষণাটি বাংলা ভাষায় এখনও রূপান্তরিত বা প্রকাশিত হয়নি তবে "বাংলা ক্রিয়াপদ" (বাএপ ১৪·৩ কা-পৌ), "বাংলা ক্রিয়া : ব্যাকরণ সংক্রান্ত শ্রেণীবিভাগ" (সা প ৯·১ বর্ষা ১৩৭২) এবং "বাংলা ক্রিয়া-পদের রূপ" (সা প ১৯৬৫), এই তিনটি প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মহিশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বে উচ্চতর গবেষণা করেন। তাঁর বিষয় ছিল "Controlled Historical Reconstruction based on five Bengali Dialects." তিনি পশ্চিম বঙ্গের পাঁচটি প্রধান উপভাষার উপাদানের ভিত্তিতে পশ্চিম বাংলার ভাষার প্রত্ন রূপ পুনর্গঠন এবং ভূ-চিত্র অঙ্কন করেন। তাঁর গবেষণা কর্মটির বাংলা রূপান্তর এখনও প্রকাশিত হয়নি তবে বাংলায় "ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন" নামক তাঁর একটি প্রবন্ধ সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে। এই সংকলনে বাংলাদেশে ভাষা ও উপভাষাতত্ত্বের অনুশীলন", "সংস্কৃত ও রুশ ভাষা : তুলনা", "কুমিল্লা-উপভাষায় ব্যক্তি সর্বনামরূপের ধ্বনি-গঠন ও রূপমূল-সমস্যার বিকল্পতত্ত্ব" প্রভৃতি ভাষাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী রয়েছে। অধ্যাপক মনিরুজ্জামান ভারতের ডঃ উদয়নারায়ণ সিংহের সঙ্গে যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে একটি গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেন, বিষয়টি ছিল—"Using Diglossic style in Bengali in varying social contexts : A case study of Bangladesh Bengalees." এ গবেষণা কর্মটি ইংরেজী ভাষায় Diglossia in Bangladesh and Language Planning" (1983) নামক গ্রন্থে প্রকাশিত তবে এটি বাংলা ভাষায় এখনও রূপান্তরিত হয়নি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মনসুর মুসার ভাষাতত্ত্ব-চর্চা সাধারণ-ভাবে সমাজভাষাতত্ত্ব এবং বিশেষভাবে ভাষা পরিকল্পনা বিষয়ে কেন্দ্রীভূত। তিনি ইংলন্ডের ইয়র্কশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিংহলের ভাষাপরিকল্পনা

নিয়ে এবং হাওয়াই ইস্টওয়েস্ট সেন্টারে সমাজভাষাতত্ত্ব তথা ভাষা-পরিকল্পনা বিষয়ে গবেষণা করেন। সিংহলের ভাষা পরিকল্পনাবিষয়ক তাঁর অভিসন্দর্ভটি অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়নি। তবে সমাজভাষাতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর দুটি গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রথমটি "ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ" (১৯৮৪) এবং দ্বিতীয়টি "বাঙালা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা" (১৯৮৫)। ভাষা পরিকল্পনাবিষয়ক গ্রন্থটিতে মনসুর মুসার যে সব প্রবন্ধ রয়েছে তার মধ্যে ভাষা পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক হল, "বাংলাদেশের ভাষা পরিস্থিতি", "তুর্কী ভাষা আন্দোলন", "ঔপনিবেশিক ভাষানীতি প্রসঙ্গে", "ভাষা পরিকল্পনা", "বাংলা ভাষা ও প্রশাসনিক নির্দেশ", "বাংলা প্রচলন সংক্রান্ত বিবেচনা"। মনসুর মুসার দ্বিতীয় গ্রন্থটি বাঙলা পরিভাষার ইতিহাস ও সমস্যা বিষয়ক। এ গ্রন্থে তিনি পরিভাষার সমস্যা এবং বাংলা ভাষায় পরিভাষা প্রণেতাদের মোটামুটি পরিচয় দিয়েছেন ; তবে তা সংক্ষিপ্তভাবে : বাংলা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগের পথিকৃৎ "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ", ঐ প্রচেষ্টা বাংলা পরিভাষা প্রণয়নে কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল আলোচ্য গ্রন্থে তার বিস্তারিত পরিচয় থাকলে গ্রন্থের নামের সঙ্গে তা সঙ্গতিপূর্ণ হত।

রাজীব হুমায়ুন ভাষাতত্ত্বে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন ডেকান কলেজ, পুনেতে। সেখানে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল "Descriptive Analysis of Sandipi in its Socio-cultural context." এই গবেষণা কর্মটির একটি বাংলা সংস্করণ "সাহিত্য পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়। রাজীব হুমায়ুন শিষ্ট কথ্য বাংলার সঙ্গে সন্দীপের উপভাষার তুলনা এবং সন্দ্বীপী উপভাষার সামাজিক--সাংস্কৃতিক সংগঠন নির্দেশ করার প্রয়াস পান। তাঁর এই কাজটিকে বিশুদ্ধ সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক বলা না গেলেও তিনি যে উপভাষা বর্ণনায় সামাজিক প্রেক্ষাপটকে ভিত্তি করেছেন তা স্বীকার্য। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক দানিউল হক হনলুলু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর কিছু বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আজিজুল হক বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে "ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত" নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন।

এ গ্রন্থের আলোচ্যসূচীতে রয়েছে, ভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্বের কালান্তর, ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত, সীমিত সূত্র ব্যাকরণ, বাক্যাংশ সংগঠন ব্যাকরণ, রূপান্তরিক ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্বের সাম্প্রতিক প্রগতি এবং প্রকৃতি, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব, শব্দার্থতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্ব এবং সামাজিক ভাষাতত্ত্ব।

১৯৬৫ থেকে ১৯৮৫ এই বিশ বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির রচয়িতাগণ সকলেই বাংলাদেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাঁরা সকলেই দেশে প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের ভাষাতাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এর ফলে যে বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব-চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ গবেষকদের ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্লেষণপদ্ধতি বিদেশী, যদিও স্বদেশে তাঁরা মূলতঃ বাংলা ভাষাতেই ভাষাতত্ত্ব-চর্চা করছেন তবুও একথা বলা যাবে না যে দেশের জীবিত ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ ভাষাতত্ত্বের তাত্ত্বিক বা পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে কোন মৌলিক অবদান রাখতে পেরেছেন। কালানুক্রমিক-তুলনামূলক, বর্ণনামূলক, রূপান্তরমূলক, সমাজ-ভাষাতত্ত্ব যে কোন পদ্ধতিতেই হোক না কেন তাঁরা এখন পর্যন্ত বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য থেকে উদ্ভূত কোন গবেষণা পদ্ধতির উদ্ভব ঘটাতে পারেননি, এমন কি তাঁরা কেউ আধুনিক পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণও রচনা করেননি। তাঁদের কৃতিত্ব ভাষাতত্ত্বের প্রায় প্রতিটি শাখায় বাংলা ভাষায় গবেষণা কর্ম পরিচালনা। কিন্তু এখন বোধ হয় সময় এসে গেছে বাংলা ভাষা বিশ্লেষণের জন্যে বাংলা ভাষার ধারণা থেকে উদ্ভূত নিজস্ব পদ্ধতির উদ্ভাবনা এবং তার মাধ্যমে বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ। বিশেষতঃ বাংলা ভাষায় খাঁটি বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা, যা ছাত্র-ছাত্রীদের কাজে লাগতে পারে বা বয়স্কদের কিভাবে অতি অল্প সময়ে বাংলা ভাষা পড়তে ও লিখতে শেখানো যায় সে পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। তাহলে বাংলাদেশে ভাষাতত্ত্ব-চর্চায় সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা আসবে, অন্যথা তা উন্নতদেশগুলোর ভাষাতত্ত্ব-চর্চার অনুকরণসর্বস্ব টীকাভাষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

তথ্যনির্দেশ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, "বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

মুহম্মদ আবদুল হাই, "ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

রফিকুল ইসলাম, "ভাষাতত্ত্ব", নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭০

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, "বাংলা ভাষাতত্ত্ব", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

ঐ, "আধুনিক ভাষাতত্ত্ব", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬

ঐ, "বাংলা সম্বন্ধবাচক সর্বনাম : গঠন ও প্রকৃতি", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আজিজুল হক, "ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত", গল্পায়ন, রাজশাহী, ১৯৮১

হুমায়ুন আজাদ, "বাক্যতত্ত্ব", বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৫

মনসুর মুসা, "ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ", মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪

ঐ, "বাঙলা পরিভাষা : ইতিহাস ও সমস্যা," মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪

মনিরুজ্জামান, "ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন", বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫